পরমশ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

ও

শ্রদ্ধেয়া বীণা বৌদি-কে

প্রথম প্রকাশ :
১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫।

প্রকাশক :
সুপ্রিয় সরকার
এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদশিল্পী :
ধ্রুবজ্যোতি সেন

ব্লক করেছেন :
মডার্ণ হাফটোন কোম্পানী

প্রচ্ছদমুদ্রণ :
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
রাজমোহন সরকার
রুবি প্রিণ্টার্স
৪০।১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা—১২।

মুক্তি

সংসার অনন্ত। তার অফুরন্ত বাণী
নীলকণ্ঠ পাখি-কণ্ঠে। তার একটুখানি
নীলাম্বরে, নদীতীরে। ধান্যের মঞ্জরী
সে-বাণীর ব্যঞ্জনায় ভরেছে লহরী।
যেখানে ভেঙেছে ঝড়ে পাথরের বুক
বাক্য আছে সেখানেও। বাণীর কৌতুক
থাকে গুহার গভীরে। যে গূঢ় জিজ্ঞাসা
অন্ধকারে ছোটে—তা' তারার আদি ভাষা।
কাঠুরিয়া কাঠ কাটে। বনের ভেতরে
অবরুদ্ধ কোন কথা দিগদিগন্তে ঝরে।
ঘোমটামুখে কলসীতে কে জল নেয়। একা
বঁড়শিপ্রিয় পুরুষের ক্ষণমাত্র দেখা।
পঙ্কের মৃণালে তবু জড়ালো কী বাণী।
এলো। গেলো। লজ্জামাখা মুখ একখানি।
বৈকালে ছেলেরা মগ্ন। নামতার পাতায়
শব্দ ওঠে,—ঝরে পড়ে গ্রামের মাথায়।
গো-খুরে গো-ধূলি ওড়ে। গ্রাম উচ্চকিত।
আমরা দেখে-শুনে এই—শান্ত সমাহিত।

এ-ঘরে তোমারি আমি দেখি আনাগোনা।
শুনি পদশব্দ। আঁকি সুরের আল্পনা—
যে-সুর সঙ্গীত হয়। তুমি সম্মোহিত।
আমি কার গান করি তুমি জানোনিত।
এ-ঘরে তোমাতে পূর্ণ আমার সময়;
ধ্যানভঙ্গ হবে বলে তবু করো ভয়।

কলসী থেকে জল ঢালো। শব্দ তার শুনি।
আর ভাবি এই রাগ জানে কোন গুণী।
উনুনে ফুঁ দাও। চোখে লুকাও যে জল
শুধু তার অকথিত তরঙ্গে চঞ্চল
ঢেউ থামে গিয়ে এই হৃদয় গভীরে ;
মুহূর্ত পরেই হেঁটে যেতে ধীরে ধীরে
মন্দিরে যা নিয়ে যাও—তারা গন্ধে ঘ্রাণে
তোমারি উদ্যান থেকে আগে বার্তা আনে।
সে-বার্তায় তুমি মূক। তার ছন্দ মিলে
আমি খুঁজি মূর্তি এক সমস্ত নিখিলে।
সে ছিল। ছিল কি ? কোন সুরে প্রকাশিত ?
আমি তার গান করি। তুমি সম্মোহিত।

রশ্মিভূত

একই সূর্যের আত্মার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল
অভিন্ন আলোকের তিনটি ভিন্ন রঙের রশ্মিমূর্তি।

প্রথমজন বললেন নেপথ্য ভাষণের মতন চট্‌পট :
'চতুর্থীর চাঁদের মতো
আমার মাথায় টাক ধরেছে মস্ত।
স্রষ্টা আমি
যুগসঙ্কটে তবুও হরিণচোর!
শেষ হল না আমার কড়া শাস্তির।'

দ্বিতীয় মূর্তির মুখে যেন জোর করে ছিপি আঁটা—
তার ফাঁকে বায়ুর বেগে ফিসফিসানি শব্দ :
'এখনো আমি বন্দী আছি নগ্ন দ্বীপের ছোট্ট 'সেলে' একা!
পঙ্গু যদি হয় দু'পা তাও দাঁড়িয়ে লেখা
শেষ হবেনা আমার।
আড়াল থেকে লোকটা এসে
খপ করে ধরবে আবার যদিও জানি হাড়জীর্ণ হাতটা।'

তৃতীয় কণ্ঠ শাশ্বত ভারতীয়, বাণীতে খরশান :
'দানের খ্যাতি ফিরিয়ে দিলাম জগৎ-জাতির ধ্যানে।
ক্রমে ক্রমে আমার গানে গানে
তানপুরাটার তারগুলোতে অনেক ধুলো জমলো।
তবুও কেন রুদ্ধগতি শ্যামের গণ্ডীতে!'

অভিন্ন আলোকের তিনটি ভিন্ন রঙের রশ্মিমূর্তির
আকস্মিক আগমনে অনমনীয় ভাব।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে ‘হল’টায় অষ্টপ্রহর হৈ চৈ
হঠাৎ সেই তিনটি আলোকমূর্তির আবির্ভাবে
এক মুহূর্তে যেন সব স্তব্ধ হয়ে গেল।
তিনটি কথা ঠোকর খেতে লাগলো
শানবাঁধা চত্বরে।
‘হলে’র বাতি হল ম্লান।
মনে মনে ছিল যেসব ঝোপঝাড়, তার তলার
হতচকিত অন্ধকার গেল যেন এক নিমেষে সরে।
মুষিকের বদলে মুষল দেখে যেন
বাকহীন হলেন মার্জারপ্রভু সভাপতি।
কী একটা শঙ্কায় হঠাৎভীরু শশকের মতো
মুখ গুঁজে থামলো
ধর্মীয় ‘বাণী’র প্রশ্রয়ে আশ্রিত রক্তিম প্রবক্তা।

বিশ্বমানবের তিন প্রতিনিধি
তিনটি রশ্মিমূর্তি শুভ্রালোকে সম্মিলিত
একটি আলোক রেখায়
হ্রস্ব থেকে আরো হ্রস্বতর হল স্থির গোল সূর্যে।
গোল এই পৃথিবীও। পৃথিবীটা গোলটেবিল।

বাঁশি

কী রোদ, কী বৃষ্টি, আর শীত!
পেট ছিঁড়ে বেরয় গোঙানি, কান্না
যখন তখন চীৎকার সেই লোকটার।

সেণ্ট্ টেরেসাস্ ইস্কুলের গায়ে ফুটপাতে
শুয়ে থাকে ছোঁয়াচে রোগীটি।
দশটা আঙ্গুল আধটা আধটা গেছে তার খসে।
হাতের চেটোয় যা পায় তা খায়;
তারো বেশী পেটে যায় গাড়ীর চাকার ধুলো,
সতর্ক লোকের ঘৃণা, গালাগালি।
মাছিগুলো শুঁড় দিয়ে দিয়ে
ঘায়ের ওপর গর্ত করে পেছনের দুই পা নাচিয়ে।
বাসা বাঁধে সেখানেই,
মহোৎসব চলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভূরি ভোজনের।
সেই ফুটপাতে যারা হাঁটে ভয়ে ভয়ে,
ভাবে : আহা মরে না কেন লোকটা।

হঠাৎ হোল কি একদিন
মাঝরাতে কান্না গেল হারিয়ে সুরের মাঝখানে;
গোঙানিও ধীরে ধীরে দোলায়িত মিড়ে বন্ধ হোল যেন
একরাত···দু'রাত···সপ্তাহ ছেড়ে···একপক্ষ কাল।
যারা জেগে থাকতো খিদিরপুরে
তখন শুনতো একটি বাঁশির সুরে—

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধুলায় তাদেব যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের 'পরে।"

ডায়মণ্ড হারবার রোডে
সপ্তাহকালের নোতুন ভাড়াটে আমি।
ঘুম থেকে জেগে চুপি চুপি ছুটে আসি
সটান—সুরের পিছু পিছু।
আমার আসার আগে বন্ধ হয়ে যায় বাঁশি!
দেখি, ফাঁকা ফুটপাতে একা ঘুমোয় রোগীটা।
তার ঘায়ের দুর্গন্ধে
সচকিত নাক মুখ বন্ধ করে ফিরে আসি
অর্ধরাতের শয্যায়।

তারপর আর সে বাঁশি বাজেনি।
লোকটাও কাঁদেনি সকালে।
ফুটপাতে যারা হেঁটে গেল তীরের চেয়েও জোরে,
দুচোখে দেখলো হাত-পা ছড়ানো উলঙ্গ রোগীটা
চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে।
সারা গায়ে তার মাছির পাহাড়।
শিয়রে কাঁদছে একটা অচেনা ছোট্ট ছেলে
যেমন ময়লা তেমনি রোগাটে।
তার হাতের কৌটোটা তুলে
দৌড় দিল অন্য একটা ভিখিরী।

ঝাড়ুদার এলো কিছুক্ষণ পরে।
ফুটপাত থেকে তুলে নিল একটা পুরানো বাঁশি,
ফেলে দিল সেটা ডাস্টবিনে!!

ল্যাবরেটরী

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল : কান্না শুনছি কার!
সে যে কী করুণ কান্না আমিই জানি।
যেন
এক ঝাঁক মাছ জলের ভেতরে হারিয়েছে রোদ্দুর,
পদ্মের বনে বাজেনা তাদের ঘুঙুর।
বাইরের নয়—ল্যাবরেটরীতে কান্না,
জানলা কপাট বন্ধ চতুর্দিক,
কে যেন বলছে, 'এখানে আর না আর না,
আমাকে মুক্তি দিক।'
অথচ সে-ঘরে আমি ছাড়া কেউ নেই,
লেখা আছে সামনেই
প্রবেশ-নিষেধ, শাস্তি, প্রটেকসন,
তারি মাঝখানে গবেষণে মন করেছি বিসর্জন।
সেতারে সাঁতার কখনো কাটিনা, মানুষ দেখি না চোখে,
যেতেও চাইনা অ-লোকস্পর্শী দূরমঙ্গললোকে।

সুইচ্‌টা টিপে সবুজ আলোটা জ্বেলে
শুনলাম এক সবুজের অনুনয়।
সে-সবুজ ছোট শ্যাওলা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়!
বলছে সে অতি আক্ষেপে বারবার
(ভাঙাগলা, তবু নীল জলে ভেজা কণ্ঠ চমৎকার)
'গত সন্ধ্যায় অণুর অগ্নি পরীক্ষা নিতে গিয়ে
সাগর থেকেই আমাকে এনেছ বাড়তি নখের ঘায়ে।
সেই থেকে কতবার
তুলছি যে আমি সকাতর হাহাকার
শুনছো না কেন তুমি,

মুক্ত প্রাণের বার্তাবাহক তুমি যদি বিজ্ঞানী।
কাস্পিয়ানের তটের তরুর ছায়া থেকে ভেসে ভেসে
আদি জননীর তরলিত কোলে দুলে আটলান্টিকে
ঘুম ঘুম চোখে ছিলাম চিলিতে নুড়িতে জড়ায়ে একা,
আদি জননীই লুকিয়ে হয়তো রেখেছিল সেইখানে
তারপর গেছি কোথায় জানিনা। তার আদি সন্তানে
এনেছ কখন দু'টুকরো করে নখরের এক ঘায়ে।

অতএব দোর খুলে
ছাড়া দাও তুমি আমাকে সাগর কূলে।
যেন কতদিন শুনিনি দু'কানে দূর-সাগরের গান,
প্রহরে প্রহরে সাগর বেলার পাখীদের কলতান।
তোমার সঙ্গে দেখা হবে একদিন
অগণিত জনগণের প্রহরাধীন।
তোমাদের দেহ সাগরের নীল স্রোতে যাবে ভেসে ভেসে
দেশ হতে দেশে। দেখব তখন একটিও নখ নেই
অনুর অস্ত্র-ঘায়ে
পোড়া পোড়া দাগ নুন নুন মাখা গায়ে।
হয়তো বা চেনা হবে দুঃসাধ্যই
নিজের অস্ত্রে নিজে না পুড়লে এ-যুগে শান্তি কই।'

দ্বিতীয় সন্ধি

প্রথমে লজ্জিত হল। তারপর নত হল মুখ
হঠাৎ আমাকে দেখে। পায়ে পায়ে ভারী নীরবতা।
কণ্ঠের চঞ্চল ছন্দ স্তব্ধ, কেন বন্ধ হল কথা
তখনই জানবে বলে পাশে তার প্রেমিক উৎসুক।
ললাটে এয়োতি-চিহ্ন। আবৃত বুকের অগ্রভাগে
আরেক গোপন চিহ্নে গুপ্ত আছে প্রথম বেদনা।
একটি প্রাণের কুঁড়ি, তার সূক্ষ্ম নিগূঢ় চেতনা
নিহিত রয়েছে সত্যে বিবাহিত প্রেমিকের রাগে।

একদা সে সত্য ছিল, ছিল ঋণী আমারি প্রেমেই।
বসন গড়াতো তার। চম্পক অঙ্গুলি নমনীয়
আমার আঙুলে রেখে পরিয়ে সে দিত অঙ্গুরীয়।
কখনো মিলেছি তার প্রেমে হার মেনে নিমেষেই।

আজ সে লজ্জিত, নত। নীরব কথায় থরথর।
এক-পা এগোয় যদি—এক পায়ে পিছনে মন্থর

সৃষ্টিসন্ধ

কে যেন আমাকে বলে সঙ্গীতের গভীর মল্লারে
"আমাকে, আমাকে নাও।" সে এক করুণ আবেদন
আকাশ হারিয়ে ফেলা শান্তিছুট্ পাখীর মতন,
অথবা ঘূর্ণির জল কোনোকালে জড়ালে কিনারে
সে যেমন বলে : 'আমি পাবো নাকি তাহলে অন্বয় ?
আমিও ছিলাম ধ্যানী গৌরীশৃঙ্গে। তোমারি শোলোকে
এসেছি নদীর বুকে। আয়ুষ্মান তোমারি আলোকে
নিজেকে জড়িয়ে রেখে গড়ে দেব বচনে বলয়।'

"আমাকে, আমাকে নাও, হয়েছি নিকটতর আরো ;
তুমি যে অনেক বড়ো, যতো চাই—না পাই নাগাল ;
কিনারে মিনার গড়ে গৌরীশৃঙ্গে পৌঁছাবে কি কাল ?
ডেকেছিলে কেন তবে ! আসা ভুল হয়তো আমারো।"
কি দেব উত্তর এর ? জানে একা কবির দিশারী
কী গোপন গঙ্গা বুকে নিয়ে আমি জীবনে ফেরারী।

অন্তর্হিত

কেন যে অন্তরে কাঁদি, অন্তরালে তাকে কেন ভাবি,
অলক্ষ্যে নিকটে থাকি যখন সে একা একা চলে,—
তবু সে আপন আজো হোল না, হোল না। মন বলে :
'নিজের দহনে নিত্য এ-ভাবে নিজেই দুঃখ পাবি।'

হয়তো বলিনা কথা। লজ্জা আছে অনির্বচনীয়।
যে-কথা আকুল করে—সে-কথাও করেছি গোপন ;
ভেবেছি : 'সে মনে যদি ভালোবাসে দেবে ঠিক মন।
যৌবনে জড়ানো থাক বাসনার মৌন উত্তরীয়।'

এই সে দিনের কথা। তারপর বিচিত্র ভূগোলে
ঠিকানা হারিয়ে ফেলে কাটায়েছি দীর্ঘ কয় মাস,
যে-কথা হয়নি বলা তা' নিয়ে লিখেছি ইতিহাস,
মনের ঘড়িতে শুধু তারই কথা পেণ্ডুলামে দোলে।
আজ দেখি নিরুদ্দেশ তার ছবি শান্ত নিরুদ্বেগ।
কোথায় ডুবলো চাঁদ ? কে ছড়ালে এ-আকাশে মেঘ ?

বিশ্বাসবতী

ললাটে সিন্দুর তার। চিত্তে নিত্য চিত্রের চিন্তন
সম্ভাব্য শরণ-সুখে। বক্ষে মাখে ফাল্গুনের ফাগ।
হাওয়ায় তনুর স্পর্শ অনুভব করে' সে সজাগ।
তথাপি কী যেন নেই। স্মরণে সতত সন্তরণ
না হলে কি প্রাণ হয় গতিময়? যদি বিতরণ
নিজেকে না করা হয়—পূর্বরাগ হতে অনুরাগ
না হলে কি পূর্ণ হয় স্বচ্ছ নীল প্রাণের তড়াগ?
তাই সে হাওয়ায় মন খুলে একা করে সঞ্চরণ।

শরণ সুলভ নয়। লোভে নয়। লাভে নয়। পাবে
সহজ বিশ্বাসবতী দৈবছুট্ দেবতাকে তার।
তবুও ঝর্ণার মতো কোনোকালে সাগরে অপার
জিজ্ঞাসা মেলাতে হবে। উত্তরের তীরে অনুভাবে
দীর্ঘ স্থিরাবলোকনে। তার আগে হবে বহু ক্ষয়,
পৃথিবী বিষণ্ণ হবে. তবু তাতে কতো না বিস্ময়!!

বিম্ববতী

সে এলো না। অসংযত চিত্ত তার হাওয়ার হিন্দোলে
ঘন ঘন দোলে। নয়—সেই হাওয়া শ্রাবণ-মৌসুমী
লুকিয়ে যে কৃষ্ণমেঘ হোতে রিক্ত হৃদয়-অঞ্চলে
বৃষ্টি ঢালে। মন তার গড়ে নিত্য দগ্ধ মরুভূমি।
সে-ভূমিতে সন্দেহের বন্ধ্যাবীজ করে সে বপন
আমাকে দ্বিচারী ভেবে। জড়ায় নিজেকে জীর্ণজালে।
যখন সে দেখে তাকে দিইনি আমার নম্র মন
হয় সে অবলুণ্ঠিত ব্যথায় সলজ্জ সন্ধ্যাকালে।

তবু তাকে ভালোবাসি। রূপে নয়। গুণে নয়। তাকে
ভালো লাগে অনুপম। অনুরাগে করি অনুভব।
সে আমার বিশ্বাসের বিম্ববতী। কখনো কৈতব
দিয়ে চাইনি তো তাকে। অভিভাবে সে পাবে আমাকে।
অথচ যে কাছে আসে, ছল-ছল চোখে যে তাকায়
হৃদয় চায় না তাকে। দেবো তাকে কী ভাবে বিদায়।

তটস্থ

আমাকে দিয়েছে শাস্তি তোমার নির্মম অহমিকা।
কোমল অঙ্গুলি-স্পর্শে নাটকের মিলনান্ত ক্ষণে
প্রথম খুলেছি তাই লজ্জার কঠিন যবনিকা
স্বপ্নের তুলিতে এঁকে তোমাকেই হৃদয়-অঙ্গনে।

তোমারো পিপাসা ছিল সমুদ্রের চেয়েও গভীর ;
গোপনে প্রতিটি অঙ্গে আঁকো তুমি অনঙ্গের নাম।
আমি যে পুরুষ, আর তুমি নারী এই পৃথিবীর,
তোমাকে রহস্যমুক্ত করে দিতে আমার সংগ্রাম।

বাইরে বিকীর্ণ রাত্রি। স্তব্ধ ঘরে মিনিটে মিনিটে
তোমাকে উন্মুক্ত করি। আমি দেখি তোমার প্রকাশ
সহজসুন্দররূপ। গান ধরে ঝিঁঝিরা ঝিঁঝিটে।
তোমাকে একাত্ম ভেবে সহজেই খুলি লজ্জা-বাস—
যে-বাসে আচ্ছন্ন তট। সে-তটের সত্য অধিকার
যে দিলো তাকেই বলি : এখানে যে রহস্য অপার।

সমুদ্র-সংবাদী

সকরিগলির ঘাটে নিদাঘের দিন অবসান।
অন্ধকারে শব্দ ওঠে ঝুপঝাপ ; বিরহী মাঝির কণ্ঠে গান।
নদীতে ঢেউয়ের বুকে ষ্টীমারে ক' ঘণ্টা আর কাটে ?
আবার রাতের ট্রেনে কুলি ডেকে মনিহারী ঘাটে
শয্যাপাতা : উঠে বসা : তবু কাটে আরামেই পথ,
তারপর জ্যোৎস্না এলে শীত গ্রীষ্ম বসন্ত শরৎ
মিলে মিশে হয়ে যায় সব একাকার,
পলক ফেলার আগে এলাম কখন কাটিহার !

দুধারে সবুজ বন। ট্রেনে একা কে ঘুমায় পথে
সমুদ্র-সংবাদ নিয়ে লৌহরথে যে যায় পর্বতে।
চায়ের পাতার গন্ধ, হাওয়ায় হাওয়ায় তার দোল
দিগন্তে দীঘলগাছ। সমতল ভূমিতে ভূগোল।

ট্রেন চলে : পার হই কিষেণগঞ্জ ও শিলিগুড়ি,
হামাগুড়ি দিযে যায় ভোরের রাতের রেলগাড়ী
গুড়িগুড়ি। পাগলাঝোরার গান ঘনায় বাতাসে।
একটি সহজ সুর উঁচুপথে ঝিরঝির আসে।
ট্রেন থামে ছোট গ্রামে। তারো চেয়ে ছোট ইষ্টেশন,
নেই বাতি, টেলিফোন, নেই লোকজন।
পৃথিবী কী মনোরম জীবনকে ঠাণ্ডা মনে হয়।
শুকনার শালবনে নেই বিয়োগান্ত যুদ্ধভয়।

তখন কে মিতস্বরে বলে কানে কানে—
(জীবনের যে জেনেছে মানে। শীতে তার কুঞ্চিত কপাল,

নগ্ন হাত, নীল মুখ, দুর্ভিক্ষের সে এক কঙ্কাল।)
অমিত বিক্রম মানে—প্রাগৈতিহাসিক গ্লানি চায়ের বাগানে।

তবু পার হয়ে যাই বিষাদ-আচ্ছন্ন মনে। আসে ধীরে ঘুম ইষ্টেশন।
এমন নিথর। তাই নাম এর হতে পারে নিদ্রা-নিকেতন।
এখানে সবাই ঘুমে অচেতন। পৃথিবী নিঝুম
ধীরে ধীরে উর্ধ্বে শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার ভাঙে ঘুম।
পৃথিবী রয়েছে তার গিঁঠে বাঁধা সুদূর সবুজ প্রান্তভাগে
আমি সেই পৃথিবীর দূত একজন অনুরাগে
অনন্ত মৌনের কাছাকাছি
নিস্তব্ধ প্রহরগুণে একা জেগে আছি।

নিম্নে আছে অন্ধকার তরাইএর ক্ষুধা,
অথচ কাছেই তার বৃহৎ বসুধা
সানুদেশে ঢেলে দেয় পত্র-পুষ্পাঞ্জলি ;
ট্রেন চলে ধীরে ধীরে। শক্তি নেই কোন কথা বলি।

আমি শুধু হাতের ওপরে রেখে মুখ
মনে মনে বলি, তবে আর কেন ? নেমে যাই। দার্জিলিং এবার আসুক।
রডোডেনড্রন্-গুচ্ছ, টাইগার হিলের সূর্যোদয়
দেখে মনে হয়,
হবে আরো আমাদের আকাশ নিকট
সবাই আসবে কাছে। সে এক বিচিত্র চিত্রপট।
তখন দুহাত ভরে দক্ষিণের দেবোই দক্ষিণা,
সমুদ্র-পিয়াস যার তাকে কে বলতে পারে চিনিনা জানিনা।

রাঢ়প্রান্তে

আপ ট্রেন থেকে বারোটায় নেমে ঝাঁঝালো রোদে
একা একা হাঁটি রুক্ষ পথ।
একটা কুকুর আসে যেন ছুটে হঠাৎ ক্রোধে
তারপর দেখি তেমনি দূরেই থম্‌কে রয়,
বিশীর্ণ তার মনে বিস্ময় ক্লান্তি ভয়।

পাশে খরা মাঠ : ছোট মেটে ঘর—কোনোটা ভাঙা
দূরে দেখা যায় রোদ্দুরে ভরা পলাশ ডাঙা।
নদী নির্জন : বুকে তার বোবা শুক্‌নো বালি
যতোদূর চোখ যায় দেখা যায় প্রান্ত খালি।
উঁচুটিলা লাল ধূলিতে রাঙা।

দূরে প্রান্তরে আকাশ শিয়রে জমে পাহাড়,
আহা তাই যেন দিগবাহার।
মুণ্ডারা নাচে, মাদলে মন্ত্র উচ্চারিত
আমারো পৌর মনের বাসনা অপরিমিত।
রাঢ়ের রুক্ষ মাটিতে ফলবে রঙবাহার।

দূরের পঞ্চ কোটের পাহাড় কী উন্মন!
বৃষ্টিতে আসে সৃষ্টি কালের মহালগন।
এমন সময় দোর ধরে তুমি মূক নীরব।
মৌসুমীময় উজ্জ্বল চোখে আমার স্তব।
হঠাৎ কেন যে হ'ল চঞ্চল পলাশ বন।
রাঢ়ের ভূমিতে আজকে আমার আমন্ত্রণ।

তোমাকে দিলাম আমার মন।

জন্মদিন

আমিও দেখিনি তাকে। তবুও সে বারবার স্বাগত জানায়।
সামান্য সঞ্চয়ে সুখী। শান্তি তার কানায় কানায়।
মাটিতে স্বর্গের রঙ। 'মধুময় ধরণীর ধূলি।'
সেখানে নীরবে কাটে নিঃসঙ্গ ধ্যানের দিনগুলি।

কতোকাল আগে জন্ম! জন্ম তার কবে?
প্রতিদিন জন্মদিন—গাছে গাছে পাখীর উৎসবে।
পাতায় পাতায় জাগে ভোর।
চারিদিকে বাদ্য বাজে : এ-আনন্দ এআনন্দ তোর।

বহুবার শুনি তার মধুকণ্ঠ। কলধ্বনি তার
কান পেতে শোনা যায়। উঠোনে ঢেঁকিতে পড়ে পাড়।
আছে তার ধন আছে। যা গেছে তা গেছে।
নিবু নিবু দীপ জ্বেলে রাত-ভোর আজো আছে বেঁচে।

যা রেখেছে তাই আছে। বুকে ধরে রেখেছে সময়।
পরাজয় হয় যদি চুরি করা সহজ তা নয়।
মনের মানুষ যদি আসে
তাদেরে তা দেবে অনায়াসে।

মাঠ আছে। ঘাট আছে। জলভরা নদী।
মাঠে গেলে শস্য মিলে বলিষ্ঠ শরীর থাকে যদি।
সহজে কে পায় তবু আকাশের মন
এই মাঠ, এই নদী, তৃণখণ্ড,—আপনার চেয়েও আপন।

আজো আসে দিনগুলি—সেদিনের মতো,
চুণীর চেয়েও দামী গোধূলি অন্তত।
ভিজে পথ? সে-কথা কাকলিভরা সকাল জানেনা।
হঠাৎ অন্তর ছুঁয়ে রৌদ্র এলে দুদণ্ড প্রান্তরে দাঁড়াবে না?

এখানে জানালা খুলে আকাশ কি দেখা যায় কোনো বাইলেনে
আমার জন্মের দিনে দেব তাকে আমাকেই এনে।
প্রতিদিন তার জন্মদিন। বাজে গান
চৌদ্দই অঘ্রান।

বোধি

আবার রাস্তায় আসি রৌদ্রগন্ধা দিনের শরীরে
রাত্রি ছিঁড়ে।

প্রগল্‌ভ সংবাদ পাঠে চায়ের দোকানে ঐকতান,
কেউ চায় পথে ভিক্ষা, কেউ চায় সভায় সম্মান।
কারো হাতে রুদ্রাক্ষের মালা,
গোলাপ গন্ধের মোহে খোঁজে কেউ একান্ত নিরালা।
ব্যর্থতায় তবুও তা শুধু পলায়ন,
বোঝেনা কি চায় ঠিক আপনার মন।
ট্রাম যায়, বাস আসে, লোক নামে ওঠে;
চিন্তনে যা যোগ্য তাই অপ্রকাশ্য শব্দময় ঠোঁটে।
শুনলেই মনে হয় কতো প্রাণময়—
বাবুই পাখির মতো তবু কিন্তু অস্থির প্রণয়,
স্ববিরোধী তাদের প্রলাপ, হানাহানি,
আমি জানি।

তাদের দু' চোখের বিলাস
যদিও চিন্তার চিত্র, ড্যানিয়ুব নদীর উচ্ছ্বাস—
ন'টায় অফিসে যায়; সন্ধ্যায় আড্ডায় অবসর অপচয়,
নিজের দাক্ষিণ্যে নেই কখনো নিজেকে দিতে দুদণ্ড সময়
অর্থহীন তর্কে কাটে দিন। ক্লান্ত স্নায়ু।
একদিন ফুরায় এ-জীবনের আয়ু।
দেখা যায়: মহাশূন্যে বৃত্তের ভেতরে
ঘুরে ঘুরে দিন গেল। এখন নির্লিপ্ত একা ঘরে।

নিজের ভেতরে আজ নিজেই কেবল ;
আশ্চর্য, যা চোখে ঝরে তাই সান্ত্বনার মুক্তোফল !
পৃথিবীর লোকজন তখন কী ভেবে যেন স্তব্ধ দশদিকে ;
তখন, তখনি যায় জানা শুধু নিজের বোধিকে।

তারি জ্ঞান—ভোরের আকাশে,—আছে মাঠে,
প্রেমের ভেতরে, আর কবির গভীর কাব্য পাঠে।

নীড়

আমাদের দেখে চমকে উঠলো বনের একটা পাখি!
বল, কেন চমকালো,
পাখিটার চোখে ঠিকরে পড়লো আলো।
কেন
আমাকে বলবে তা কি
বনের একটা পাখি?

তারপর দেখি একটু পরেই দিগ্‌চঞ্চল সুরে
উড়ে
ঠিক দু'জনের মাথার ওপরে বৃত্ত রচনা করে।
মাটি থেকে খুটে খপ করে খড় চটুল চঞ্চুপুটে
একা সেই পাখি গেল কোনখানে ছুটে।

তিমিরান্তক

ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে চুপি চুপি ঘরের ভিতরে
একা চাঁদ আলো নিয়ে এসেছিল নাকি ক্ষণতরে !

হারিয়ে সমস্ত আশা ক্লান্ত আমি ছিলাম ঘুমিয়ে,
তাই, চাঁদ ফিরে গেছে; আমাকে সে তোলেনি জাগিয়ে

হতে পারি রিক্ত আমি : হতে পারে পরিশ্রান্ত মন—
'এখানে আসবে চাঁদ', ভাবতাম তা যদি তখন ॥

মনে-মনে

সারাদিন ধরে ঝিমোতে দেখেছি আকাশের সারামুখ,
কোন ভয়ে গায়ে জমেছে জং-এ।
বিরাট জগৎ এবং আমিও ভাবনায় উৎসুক—
আড়ালচাঁদের ফ্যাকাশে রঙে।

হবে, হবে, বলে' হয়নি বৃষ্টি এক ফোঁটাও,
আকাশের নেই মুক্তি যেন—
যতোই বলিনা এবার তারার ফুল ফোটাও,
তোমার ও-মুখ নামিয়ে কেন!

অশোক তরুর তলে বসলাম দুই জনে।
বসেও দিলনা বচনে ডুব।
মন দিতে গিয়ে দেখি কী যে ভাবে সেও মনে,
বৃষ্টিও যদি নামতো খুব।

আছি : আছি

কলম রেখে এলাম চুপি চুপি।
একটু নড়ে উঠলে—খসে পড়লো আঁচল নীচে।
ঘুমিয়ে আছে সারাদিনের পর।

গুমোট ঘরে বইলো যেন ঝড়॥

সবুজ আলো জ্বলছে ঢুলে ঢুলে।
দেওয়াল ধরে একলা জাগা হতাশে টিক্‌টিকি
কোথায় গেল এক নিমেষে সরে।

ঘুমন্ত মুখ দীপ্ত সারা ঘরে॥

সারাটা দিন হয়নি কোনো কথা।
গভীর রাতে উঠলো বেজে রেলগাড়ীতে বাঁশি
চমক দিয়ে কোথাও কাছাকাছি।

ঘুমের ঘোরে বললে : 'আছি, আছি॥'

যদি

একটি তারার একটু ইশারা আকাশের এক কোণে,
নিবু-নিবু তার রেখাটি মিলায় দূরের সবুজ বনে।
কুয়াশার নদী নেমে আসে, যদি নিবে যায় সেই রেখা।
হাতড়িয়ে মরি মাটিতে আকাশে আলোর রশ্মি একা।
পৃথিবী অন্ধকার,
জোনাকিও তার এক নিমেষের চপল অলঙ্কার।

একটি হাতের একটু পরশ হৃদয়ের এক কোণে
থাকে যদি, ভয় থাকে না কখনো সমুদ্র-মন্থনে।

শিল্পী

আমি যা লিখেছি, তাই মহাকাল যদি মনে রাখে,
আমার সংগীতে যদি কুঁড়ির পাপড়ি খুলে যায়,
দিগন্তে আকাশ নামে, নিথর পাথর মুক্তি পায়
মাটির গভীরে থেকে। তবু মনে কে রাখে আমাকে?

যতোই বাঁধুক মালী গোলাপের প্রৌঢ় মরা ডাল
ফুলের গৌরবে, তার হয় নাকি যবনিকাপাত?
মৃত্যুর অতল তলে ম্লান হয় নগ্ন দুটি হাত—
যতোই ঝরুক অশ্রু ভুলে যাবে মৌন মহাকাল।

বহু যুগ পার হয়। মাটি খুঁড়ে আরেক স্বাক্ষর
প্রত্নতত্ত্ববিদ আনে—শিলীভূত আমারি পাথর।

ঘাস

ঘাসগুলি সব শুকিয়ে যায়। যায় যে মরে কেন
কেউ জানেনা যেন।
বনস্পতির তলায় তারা ছোট্ট ছোট্ট সেনা,
তারা সবাই ছিল আমার অনেক দিনের চেনা।
সূর্য রোজই উঠে,
রোদখানি তার—বনস্পতির পাতারা নেয় লুটে।
অনেকে তাই দেখেছে—এই আমি নিজেও দেখি,
কেউ বলিনি : বনস্পতির কাণ্ডখানা একি।
গাছের পাতা পেড়ে
শুকিয়ে যাওয়া ঘাসগুলিকেই দু'পায়ে যাই মেড়ে।
একটু রোদ পেলেই তবু এই ঘাসেরা বাঁচে।
কিন্তু সবাই অবনত বনস্পতির কাছে।

বনস্পতির তলায় মরে যাচ্ছে বারোমাস
জীবন্ত সব ঘাস।

খবর

ঠক্ ঠক্ করে আওয়াজ কাঁপছে
পাহাড়ের এক কোণে।
কান পেতে দুটি হরিণ হরিণী শোনে।
কীভাবে কখন নিভে গেল নীচে
পাহাড় চূড়ার আলো
পাথরে পাথরে নীল রেখা-আঁকা-
বিদ্যুৎ চম্‌কালো
ঝির্‌ঝির ঝরণায়।
আঘাত পড়ছে তবু্ পাথরের গায়।

দূর দূর গাঁয়ে পিদিম জ্বলচে
শব্দ জমচে শীতে।
ওই পাহাড়েই ফসল ফলবে
বিংশ শতাব্দীতে।

মন্দাকিনী

আমার বিপুল বিশ্ব। আমিই বিপুল বিশ্ব নিজে।
যৌবন বন্যায় ব্রতী মন্দাকিনী, তুই ভোগবতী
মাঝে তার। কি ক্ষতি ছু'পাশে যদি কিছু শষ্প ভিজে।

ভেবো না করেছ জয়। ভেবে যদি করো উপহাস—
ধূসর মরুর রুক্ষ লজ্জা তুমি পাবে বারোমাস।

আমিই বিপুল বিশ্ব। বসে আছি শিখর চূড়ায়।
দেখি তোর রূপান্তর,—ছন্দ তোর দেখে মনোহর
এমন হতেও পারে কখনো তা ছু'চোখ জুড়ায়।

তুমি তবে এসো নিজে। তুলে নাও আমার রাগিণী।
তাকাও অনেক উর্ধ্বে, আর নিম্নে সমুদ্র ছাড়িয়ে;
মৃত্যুকে যা বড়ো করে, জীবনকে যা করে মহীয়ান
আমারি চূড়ায় এসো, শুনি তার আদিগন্ত গান;
নয়তো মায়ায় ভুলে তুমি যাবে কোথায় হারিয়ে।

তবু কি সে শোনে কথা। কোথায় যে ছোটে মন্দাকিনী।

পূর্বরাগ

দু'বেলা দু'দণ্ড দেখি। বাইরের খোলা বারান্দায়
যখন দাঁড়ায়—সূর্য বিস্ময়ে থামায় তার গতি ;
নিস্তব্ধ দিগন্ত তাকে নীপবনে স্বাগত জানায়।
অনবগুণ্ঠিত তার চোখে মুখে আশ্চর্য সংগতি,
যৌবনে অবনী জয়ী, এ-জীবনে পরম নির্ভব।
ললিত কণ্ঠের তাব ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী
যেদিন বৈকালে বাজে—সে-রাগের সাগবে হারাই,
আড়ালে নিকটে যাই। ভাবি হবে আলাপচারিণী
যখন থামাবে গান। তবু ফিরে করেছি খোদাই
অক্ষবে আস্তীর্ণ করে তার নাম প্রতিটি প্রহর।

কী ভাবে যে কথা বলি। লেখা কথা বলাই কঠিন।
সতৃষ্ণ চোখে সে চায়। স্মিত মুখ নামায় কৌতুকে,
গোপনে লালন করে বুকে কথা। আনে না তা মুখে
লজ্জায়, জড়ায় সে যে আমার চিন্তায় অনুদিন।
আমাকে দেখলে তার ভুল হয় গান। শুধু ঝরে
না-বলা-কথার মধু বিন্দু বিন্দু তার কণ্ঠ স্বরে।

ঘরনী

আমার চিন্তার জালে অচিন্ত্য চিত্রের ছায়াছবি
চয়ন করেছি নিত্য নিটোল নিখুঁত শব্দায়নে।
সমুদ্রে স্বেচ্ছায় বন্দী পাখীদের পাখার স্বননে
হৃদয়-প্রাঙ্গণ পূর্ণ। কখনো বা ভোরের ভৈরবী
বেজেছে নীরবে। তাই বুকে নিয়ে, লিখে নিয়ে রঙে
সূর্যের অব্যয় বর্ণ দিয়েছি প্রাণের পরিচয়।
তবু কি অপূর্ণ যেন আজো গানে। শুধু মনে হয়,
শব্দের যাদুতে কা'কে বর্ণন করিনি কোনো ঢঙে!

তুমি যে অবর্ণনীয়। পরম রহস্যে রমণীয়।
স্বনামে শঙ্খিনী তুমি। বর্ণে দীপ-দীপ্ত মেঘমালা
আমারি ঘরনী। চিনি তোমাকে, তবুও অন্তর্জ্বালা
কী যেন বুঝিনি। তুমি সামান্য সঞ্চয়ে নমনীয়।
তোমারি ইঙ্গিত-গুণে জীবন-পিপাসা বেড়ে যায়,
আমার অপূর্ণ গান তোমাতেই তৃপ্তি পেতে চায়।

দ্বৈত

দিবসান্ত তাকে ভাবি। স্বপ্নে দেখি স্তব্ধ দু' নয়ন।
তাকে ভেবে ধীরে ধীরে সব কথা ম্লান হয়ে যায়।
সারাদিন পথে পথে ভাঙছে পাথর। গৃহাঙ্গন
কেউ মোছে। জল ঝরে। কী স্তব্ধতা ভাসে চেতনায়
তবু শব্দের জোয়ারে। আর, যদি আশ্চর্য দুপুর
নামে নীলাবগাহনে, মৌন সুরে স্নিগ্ধ ভূমণ্ডল,
ছাদে উঠে কেউ যদি চুল ঝাড়ে, পোহায় রোদ্দুর—
তখনো ওঠে না নড়ে মগ্ন অন্তরের অন্তস্তল।

ছোট ঘরে ফুল ফোটে। শান্ত টবে হাসে বারমাস।
তারি মাঝখানে স্থির আমার আকাশে মিটিমিটি
তারা চায় তার নামে। তারপর অন্য ইতিহাস।
সংসারের যাঁতা ঘোরে। ছিঁড়ে পড়ে পুরাতন চিঠি।
ভীরু কথা ভুলি তার। শ্রুতিপথে সশব্দ বিদ্রূপ
তোলে বাহুর বলয়। আমি মত্ত চৈত্রবনে চুপ।

অভাবিত

দুচোখে দুচোখে ভাব। ভাবনায় বুক দুরুদুরু।
ঘরেও বসে না মন। বাইরেও অলস অসুখ।
চোখের জলের কাঁচে ভেসে ওঠে একখানি মুখ।
হঠাৎ কী হ'তে যেন একদিন কথা হোল শুরু।

ভেবেছি : 'দুজন পূর্ণ দুজনে কি'? অনবরতই
মনের খবরে ভরে হাতে তুলে দিলে তবু ঋণ।
'আমি যা' চেয়েছি নিজে, তুমি তা' চেয়েছ এতোদিন—
বলেই ভেবেছি বলি : 'সব কথা বলা হোল কই!'

সে-কথা এখন বলা না হোলেও, কথা কাটাকাটি,—
আমাকে চিনেও লাগে আজ যেন অচেনা অচেনা।
সকালে বাজার আনি : দুপুরে আপিস : আছে দেনা।
আকাশ তেমন নয় কানা আয়নায় পরিপাটি।

আমি আজ আরো কাছে। আর আছে অভাবের ঘর।
দুচোখে দুচোখে ভাব! চাওনি তো এসব খবর।

অলিখিত

যতোই বলি না তাকে, মুখে তবু শব্দ নেই তার।
যদি বা ছটায় উঠি ভোরে, ফিরি রাত বারোটায়।
তখনো দাঁড়িয়ে ঠায় মৌন ঠাণ্ডা ভিজে বারান্দায়।
সযত্নে রচিত শয্যা ঘরে, ঢাকা উত্তপ্ত খাবার।
আমার মুখের গন্ধ উগ্র; ভীরু হাতে জ্বালে ধূপ।
কাগজ কলম কালি পাশে রাখে। শান্ত স্নিগ্ধ স্থির—
আমার সৃষ্টির কালে দীপ জ্বেলে সে গড়ে মন্দির,
যতোই হোক না রাত্রি—অনিদ্র সে। তখনো নিশ্চুপ

প্রথম দিনেই সে-ই বলেছিল—বুক দুরুদুরু—
'আমাকে নিয়েই গল্প?' তাই নিয়ে গল্প বলা সুরু।

অথচ আশ্চর্য এই—তার গল্প আজো অলিখিত।
সঙ্কীর্ণ গলির মোড়ে সৃষ্টি করে অ-লোক রচনা
যারা অস্পষ্ট আলোকে—কাব্য-ছন্দে তাদেরি ব্যঞ্জনা।
সে থাকে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা বারান্দায় একা উপেক্ষিত।

অবচেতন

ঘুম ভাঙে শব্দ শুনে।   স্বপ্নে বলা তোমার প্রলাপে
ঘরময় শব্দ কাঁপে।   ভাবি, তুমি আশ্চর্য হেঁয়ালি !
অসংলগ্ন বর্ণে অন্য নাম শুনি তোমার সংলাপে।
মুখোমুখি আমি ; তবু অন্তরের আদিগন্ত খালি ।

প্রত্যহ প্রভাত আনে তোমার আনম্র কণ্ঠস্বর।
অক্ষয় কল্যাণস্পর্শে ঋদ্ধ কর আমার কল্পনা।
জীবন-স্বাচ্ছন্দ্যে মুক্ত অফুরন্ত আনন্দ-নির্ঝর।
আমি দিলে অর্থ কিছু, তুমি দাও অগাধ ব্যঞ্জনা।

আবার জাগাবে ভোরে।   নিজ হাতে ধোয়া বারান্দায়
সাজাবে ফুলের গুচ্ছ।   এনে দেবে কাগজ-কলম।
অন্তরের অন্তরালে তবুও কে আমাকে ধাঁধায় ;
অস্পষ্ট নামের তাপে অনুতাপে কাঁদে বিহঙ্গম।

আজ আর ভোর নেই।   বদ্ধ ঘরে রুদ্ধ অন্ধকার।
পাশাপাশি বাহুলগ্ন, তবু শয্যা শূন্য।   তুমি কার !

স্বর্গাদপি গরীয়সী

তোমাকে বেসেছি ভালো। তাই মৃত্যু দূরে গেছে সরে।
দু'হাতে লাঙল ঠেলে, মাটি কেটে সারাদিনমান—
শ্রান্তিতে যখন বসি নিজ-হাতে গড়া ছোট ঘরে—
আমাকে বিমুগ্ধ করে তোমার পাখির কলতান,
এবং অবাক হই শিশুদের স্নিগ্ধ ভাষা শুনে—
যে-ভাষায় কণ্ঠ তোলে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রঠাকুর,
জেলে যদি মাছ ধরে চিন্তা করে সমস্ত দুপুর;
সে-ভাষায় বৃষ্টি নামে, ফুল ফোটে আশ্বিনে ফাল্গুনে।

তোমাকে বেসেছি ভালো। তাই গেছি সাঁওতাল পল্লীতে।
কাকদ্বীপে গেছি আমি। জীবনের সংগ্রামে মুখর।
সিংহের নখরাঘাতে প্রাণ হয় যদিও ঊষর
হে বাংলা, উদ্দীপ্ত হই আজো সেই তোমারি সঙ্গীতে।

আমাদের ভাইবোন ঘরনীর জন্মদাত্রী তুমি,
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী ও জন্মবঙ্গভূমি।

বৃষ্টি

এইবার শেষ হোক : বন্ধ হোক অমিতবর্ষণ।
আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্রে ব্যাঙেদের উন্মত্ত কোরাস
পৃথিবী শুনেছে ঢের। শুনেছে সমস্ত লোকজন
যাঁতার কলের শব্দে বৃষ্টিপাত। দুরন্ত উচ্ছ্বাস

বিরহী করেছে যদি অনুভব ভগ্ন তার ঘরে
বৃষ্টির সময়ে মগ্ন ছিল না সে বিরহ-রভসে ;
দু'হাতে তুলেছে জল মাটি থেকে ঘরের ভিতরে।
এ-যুগে কে চায় বৃষ্টি আষাঢ়েরো প্রথম দিবসে।

ভাদ্রের সংক্রান্তি শেষে আশ্বিনের কিছু রোদ এলে
তবেই হৃদয় কোনো—হতে পারে কখনো চঞ্চল।
হে আশ্বিন, তুমি এসো সোনালি রোদের ডানা মেলে,
নিয়ে চলো অন্য দেশে যেখানেই নেই বৃষ্টি জল।
হৃদয়-সেতার তবু স্তব্ধ কেন ঠিক নেই তারো,
এ-বৃষ্টি হলেও দুঃখ, না হলে যে দুঃখ বাড়ে আরো।

চতুর্দশপদী

দ্রৌপদীর বস্ত্র নেই : সিঁথিতেও জোটেনি সিঁদুর :
দু'হাতে দু'খানি চুড়ি—ব্রোঞ্জে তৈরী কিংবা তৈরী খাদে।
সুগন্ধি সাবান সেন্ট নেই তার। সে যে অন্ন রাঁধে
দু'মুঠো তণ্ডুল দিলে র‍্যাশনের—দয়ালু বিদুর।
তবু কি নিস্তার আছে ? এ-যুগের কৌরব-কবলে
দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হায়। দুঃশাসন ডাক ছাড়ে শুনি।
কবাটে লাগিয়ে খিল বসে আছি—লজ্জায় ফাল্গুনি
যেমন দ্বাপরে ঠিক উপবিষ্ট ছিল সভাতলে।

সাহায্য পাই না আমি এ-কলিতে কৃষ্ণ বা কাহারো।
তাইতো এখন ভাবি বিবাদে কি ফল আছে কোনো।
হে প্রিয়ে নিকটে এসো, আমার এ অনুরোধ শোনো :
লিখিতে বলোনা তুমি সিডিসাস কাব্য কিছু আরো।
দ্রৌপদী কহেনা কথা। বস্ত্রখণ্ড জোটে তার যদি,
প্রেমের এ কাব্যে লিখি পলায়নী চতুর্দশপদী !

মহাপ্রলয়

কে দিয়েছে মহত্তর জীবনখানি দান,
সন্ধ্যা হলেই কে শোনাতো ঘুমপরীদের গান,
সকাল হতেই আকুল হাতে কে দিতো ঝুমঝুমি ?
—সে তুমি, সে তুমি !

খেলা যতো থামুক—আজো শিশুই যেন তার,
তাই পরেছি চিরন্তনী স্নেহের সুতার হার,
যেখানে যাই চোখের জলে কার ছায়া চঞ্চল ?
—সে তুমি কেবল !

এ-মন হঠাৎ উতল হল করুণ কলস্বরে,
সেদিন ছিল বাইরে প্রলয়, মহাপ্রলয় ঘরে,
অস্তাচলে অনুদয়ের সজল কালো রেখা ?
—কী হারালো লেখা !

অনুদয়ের একটু আভাস। হেঁটে দীঘল নদী
এলাম দ্রুত—কোথাও মেলে প্রাণের ধারা যদি,
শূন্যঘরে শব্দ তোলে প্রচণ্ড মৌসুমী :
—নেই তুমি, নেই তুমি !

সবহারাদের চোখের জলে সাগরও হয় তবে :
সবাই বলে। আমরা বুঝি কঠিন অনুভবে।
অস্তাচলে যখন ছিল সজল কালো রেখা
—কোথায় ছিলাম একা ?

এবার হাতে ঝুমঝুমি নয়, নয় পরীদের গান,
আমরা পেলাম সবাই মিলে মহত্তম দান,
এবার আছে সামনে বিরাট শস্যশ্যামল ভূমি
—সেও তুমি, সেও তুমি।

ইচ্ছামৃত্যু

ফল থেকে বীজ, কিংবা বীজ থেকে ফল :
—থামাও থামাও সেই অষ্ট প্রহরের কোলাহল।

জীবনের বেড়া দিয়ে কচি শিশু গাছটির মালিক
মৃত্যুকে দু'দণ্ড দূরে রেখে দেয় ঠিক—
তবু দূর দুরন্ত বাতাস এসে কখন হঠাৎ
সেখানেই
বাড়ায় অদৃশ্য তার হাত।
জীবন যে দেয়, দেখি, সেই করে জীবন সংহার।
তাই বা কে করে অস্বীকার—
জন্ম মৃত্যু, মৃত্যু জন্ম—একটি আত্মার দুটি পাখি ;
যে-কথা সহজ লভ্য, দর্শনে তা বোধ্য হবে নাকি !

মৃত্যুর সীমানা
বিজ্ঞানে যাবে না জানা—
ঠিক নয়।
মৃত্যুঞ্জয়
হবে ঘাস, নদী, প্রেম, কবির কবিতা,
মাতা-পিতা।
সব ভয় দূরে যাবে চলে,
ইচ্ছামৃত্যু হয় যদি—হবে শান্ত প্রাণের কল্লোলে।

দুটি শর

একখানি শর নয় :
আছে দুটি শর
নির্মম ব্যাধের হাতে মৌন নীল তূণের ভিতর।
প্রথম শরের ঘায়ে শোক হল শ্লোক ;
ক্রৌঞ্চ শুধু কাঁদে না তো,
যুগে যুগে কাঁদে বিশ্বলোক !

কালের নিষাদ হাসে :
তার অন্য শরে
কবির বুকের রিক্ত দীর্ঘশ্বাস—রক্ত হয়ে ঝরে।
আমাদের দীর্ঘপদী শ্লোকে তার নাম
হয়তো যায়না লেখা,
কবিদের এই পরিণাম !

নয় এই পরিণাম :
আর সেই তূণ
লুকিয়ে রাখেও যদি রুষ্ট বুকে অঢেল আগুন—
সহজে কি ছাই হয় দগ্ধ সাহারায়
'সাগর তীরের পাখী',
'শঙ্খমালা' আগুনে হারায় ?

আলোর ইশারা

বহু দূরের একটি আলো ভাসিয়ে দিয়ে যায়।
কিসের আলো ? একটি আলো প্রজ্ঞাপারমিতার।
সেই আলোটি হয়তো কোনো পাঁজর-ফাটা-চিতার,
চেতনা যার অর্থ খুঁজে পেয়েছে চিন্তায়।

সেই আলো-কে লক্ষ্য করে যদি তীরন্দাজ,—
তীর ছোঁড়ে সে লাল আকাশে কলম্বিয়াকূলে,
তীরটা যদি পড়েও গিয়ে ককেশাশের মূলে,
আলোটা তাও মহাদেশের মাথায় ছোটে আজ।
তাকাও দেখি আলোর দিকে, তাকাও দেখি নীচে,
কতোজনের মৃত্যু-ঘেরা ঐ আলোটা নীল ;
তাতেও যদি না পাও খুঁজে গভীর গূঢ় মিল,
তোমাদের ও-খোঁজার মানে মিছে।

নিবিড় নিজে থাকেন যারা দেশে দেশেই ধ্যানে
সবার কথা চিন্তা করে তারা যে সংসারী।
তাদেরি ছাই বহন করে মহাকালের বারি।
আলো তাদের ছড়িয়ে পড়ে জ্ঞানে।

সৃষ্টির গভীরে

আমরা জেনেছি। জয় করেছি জগৎকে।
—এভারেস্টে গেছি।
মেরুবিজয়ের পতাকা এখন পতপত করে মানুষের।
চন্দ্রালোকের খবর আসে দু'বেলা বেতারে।
যখন তখন যাওয়া আসা সেখানেও।

হে মানুষ, তুমি হলে এইবার সৌরজগৎপতি।
উপগ্রহের জীবের সঙ্গে চলছে খবর বিনিময়।
মাধ্যাকর্ষণের পরাভূত নিয়মেই
শূন্যলোকে স্থির প্যারাসুটে বসবে
সৌরজগতের অধিবাসীদের পার্লামেণ্ট।
নেই অতিপ্রজের ভাবনা।
পুরুষ হচ্ছেন নারী, নারীরা হচ্ছেন নর।
সমুদ্রের অতলেও জল সরিয়ে বেঁধেছে ঘর হাজার মাইল জুড়ে
জলকন্যাদের দু'বেলাই অসম্পন্ন গান :
সকালে ভৈরবী, সন্ধ্যায় ঝিঁঝিট।

আন্দামানের আদিম মানুষ এলো, আসে আফ্রিকার 'বুশম্যান'
দূর হচ্ছে নিকট : নিকট নিকটতর।
চোখ মেলে দেখলেন কবি :
কেমন শোভিত—ক্ষেতে ক্ষেতে ধানের মঞ্জরী
হিমালয়ের হিম লেগেছে তা'তে।

এমন সময় জরথুস্ত্র এলেন এগিয়ে—
বৌদ্ধ আনন্দের মতো তার স্মিত সুন্দর বাক্যভঙ্গী।

বললেন তিনি : এবার জানো নিজেকে,
উদ্বেল করো, উজ্জ্বল করো মনের দীপাধার।
সূর্যের চেয়েও তীব্র তেজ তোমাদের মধ্যে সমাহিত।
সুন্দর সৃষ্টিতে হয় সেই তেজের প্রকাশ—
সেই প্রকাশ ঘটে কুমোরের চাকাতেও, কাঁচা মিস্ত্রীর হাতেও
মানুষেরা পরস্পর নিজেদের জানুক জানাক তা দিয়েই।
তখন হবে না কোনো অগ্ন্যুৎপাত এই পৃথিবীতে,
ধোঁয়া তার লাগবে না মঙ্গলের গায়ে।

তারপর জরথুস্ত্র হারালেন তার সৃষ্টির গভীরে।

ছায়াঘেরা রোদ্দুরে

ধীরে নামে দামে দামে রোদ্দুরের ছবি,
মুখ দেখি নীলজলা পুকুরের ঘাটে।
শালুকের তলে ফাৎনা নাড়ে ঘুঘুমাছ।
পাড়ে এসে কেউ বসে, কেউ যায় মনসুর-হাটে।
দূরে পাঁতিবনে কাঁপে ছোট ছোট গাছ।
বক ওড়ে টিয়াবাসা-মাঠে।
ঘোমটা টেনে জল তোলে বউ। স্বচ্ছ কাচ
আকাশের ওড়না ওড়ে। গোধূলিতে মৃত্তিকার রঙ
ঘণ্টা বাজে অন্ধকারে দূরে ঢং ঢং

কলকাতায় মনে পড়ে : কলসীভরা জল,
সরু দুটি হাত টলোমল,
কাঁপে সারা পুকুরের বুক।
মনে পড়ে : একটি ছোট ঘোমটা টানা মুখ
অবিরল কৌতুকে উৎসুক।
ছায়াঘেরা রোদ্দুরের রঙে ডোবে মন ;
এ-জগতে এলাম কখন !

দেখা যায় ছুটে যায় গঙ্গায় জাহাজ।
আজ
বন্ধ থাক কাজ।।

ত্রিনয়নী

অমর একটি মন : দুখানি অমন
তার কালো চোখ,
তা দিয়ে গড়বে নারী ভূলোকেই সত্য স্বর্গলোক।
ভূলোকের দীর্ঘপথ এমন জটিল
সিঁড়িই হল না সৃষ্টি,—দগ্ধ হল নিজে তিলে তিল।

একখানি মন, তবু দু'চোখে দু'দিকে মেলে পাখা ;
দ্বিতীয়তে ভীরু প্রেম আঁকা।
প্রথম চোখের কোণে সে-মনের লালস শলাকা—
সর্পিণীর মতো তার গতি,
'এক'-কে হনন করে 'আরেক'-কে জানায় প্রণতি।
মধুর সে-'এক' মানে সহজ বিশ্বাসে পরাজয়,
বেদনা ও ক্ষয়
দ্বিতীয় নয়ন-তলে স্তব্ধ হয়ে রয়!

প্রথম চোখের কাছে দ্বিতীয় নয়ন মানে হার,
পৃথিবী দিলো না আজো সে-নারীকে কোনো অঙ্গীকার।
দ্বিতীয় নয়ন-কোণে কাঁদে তার পলাতকা মন।
তখন যৌবন গেছে।
আছে দগ্ধ বিদগ্ধ নয়ন।

নাটকত্ত্ব

নটীকে সুধায় নট : [দৃঢ়মুষ্টি, কম্পমান স্বরে]
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আমি তোরে
দিয়েছি উজাড় করে। আজো কি অপূর্ণ তবু সাধ ?
সত্যের গভীরে তোর গড়েছি গানের বনিয়াদ।
যে রাগ-রাগিণী শুনে দেশে দেশে রাত্রি হয় ভোর
সেই রাগে ঘর পূর্ণ তোর।

নটী বলে : [রুদ্ধ কণ্ঠে] যদি হোল স্বচ্ছা-স্বয়ম্বর
বুকের কাঞ্চন কুঁড়ি, বলো, কেন শুকিয়ে পাথর।
তুমি শুধু মূর্ত হও ধ্যানীর মূর্তিতে
রাগ রাগিণীতে।
নূতন নায়ক-স্পর্শে কুঁড়ি যদি মূর্ত হয় প্রাণে
দেহ সত্য যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত গানে।

স্তব্ধ হল নটী। তার নীরব কিঙ্কিণী।
ভেসে আসে নেপথ্যের করুণ রাগিণী।
যদিও আসেনি মঞ্চে নূতন নায়ক,
যুবক দর্শক
নটীকে পরাল জয়মালা,
সাঙ্গ হল পালা।

সৃষ্টি

কাল কালানলে পুড়ে গেছে সারা বন,
দূরে গেছে উড়ে যতো পলাতক মন।
পা ফেলার নেই মাটিতে একটু ঠাঁই,
পড়ে আছে পোড়া সবুজ পাতার ছাই।
নেড়া নেড়া গাছ দাঁড়িয়ে ইতস্তত,
ওপরে আকাশ লজ্জায় নীল, নিশ্চুপ অবনত।
পাখি উড়ে গেছে : করুণ মনস্তাপ।
সারা বনময় মৃত্যু-ভয়ের ছাপ।

পাখি নেই, তবু শুনলাম যেন কার
বহু দূরে ভেসে আসা ক্ষীণ কেংকার।
পাতলাম স্থির দুটি সচেতন কান,
বীভৎস বনে বাজে জীবনের গান!
এই দাবদাহে ঘর
বাঁধবে আবার কোন অরণ্যচর?
পোড়া অরণ্যে ধ্বংসলীলার অদৃশ্য হাত পাতা,
খসে পড়ে নীচে পুড়ে যাওয়া শেষ-পাতা।

একা একা চলি, সময় পুড়ছে রোদে,
বিবিক্ত বনে ঠিকানাবিহীন হাঁটি বিমর্ষ বোধে।
দিবস পাখিরা নেই, আছে কেংকার।
হঠাৎ সামনে দেখি কী চমৎকার—
দগ্ধ বনেই সৃষ্টি চলছে ঠিক নিঃসংশয়,
বাজ-পড়া গাছে দুটো পেঁচা করে আনন্দ বিনিময়!!

ঋতুকন্যা

আষাঢ়ে জলের ভারে যখন হয়েছি বীতরাগ
নীরব তপস্যা নিয়ে এসে তুমি ছড়ালে পরাগ
যৌবনের। অকাল বসন্তে ঋতুমতী হবে বলে,
তুমি যে ঋতুর কন্যা। ঘন মেঘদল গেল চলে,
কেতকী কুসুম নয়—ফুটলো বসন্তের কতো ফুল,
ছড়ালে তোমার কালো মেঘের মতন খোলা চুল।
গাছের পাতার ফাঁকে স্বরচিত কোকিলের স্বর
ঝরলো পড়ে। তোমার নয়নে বৃষ্টি নামল ঝরো ঝর।

আবার বসন্তে নীল গগনের তলে একা একা
যখন রয়েছি, তুমি নিয়ে এলে তোমাকেই লেখা
আষাঢ়ের পত্রগুচ্ছ, 'আমিই অলকা সেই' বলে।
অথচ বাদল-চিহ্ন রাখোনিক চোখের কাজলে।
আকাশে ঘনালো মেঘ ; হাওয়ার সফর , চৈত্রবন
মিলালো মেঘের শূন্যে। জেগে ওঠে কদম্ব কানন।
তোমার কোমল কণ্ঠে তখন গুঞ্জন মৌমাছির,
আকাশে গভীর মেঘ ; তোমাতেই বসন্ত নিবিড়॥

তোমার স্পর্শের গুণে বসন্তে বাদল আসে ফিরে
আষাঢ়ে বসন্ত আসে,—যৌবনের রাজ্যে ফিরে ফিরে।
কিন্তু যদি এ চোখ হারায়, আর হারাই যৌবন,
আমার জীবনে দিতে ঋতুকন্যা কি আনবে তখন—
যদিও জানিনা—আছে জীবনে যৌবন যতোকাল
আমার কামনা ঘিরে ততোদিন প্রত্যহ সকাল
থাকুক অনড় প্রায়—স্বর্গ-স্বপ্ন এই মৃত্তিকাতে।
সে-দিনের কথা ভেবে আজ তোকে কে চায় হারাতে।

নাটকীয়

তখন সপ্তম অঙ্কে নাটকের হত নাকি শেষ।
সে-নাটকে ছিল রাজা। মহাশৌর্যে তিনি বলীয়ান।
ছিল তার মন্ত্রী সৈন্য সেনাপতি। নান্দী-মুখে গান
শোনা যেত সে-রাজার। সে-নাটকে সাজতো সবিশেষ
বীতনিদ্র রজনীতে রিক্ত জনতাই। বিদূষক
কেউ হত। কেউ রাজা। নরঘাতী। কেউ দ্বারপাল।
সে-যুগ খণ্ডিত এক ব্যথাযুত লাঞ্ছনার কাল।
এখন তৃতীয় অঙ্কে ক্ষণ দৃশ্যে সমাপ্ত নাটক।

শূন্যহাতে রাজ-সজ্জা। এই প্রলোভনে কতোদিন
থাকা যায়। রাজা নেই। মন্ত্রী সৈন্য নিয়েছে বিদায়।
রজত মুদ্রার যুগ এলো—আজ তাও যায় যায়।
অভিন্ন সমাজ এক—থাকবে শুধু ক্ষয়ক্ষতিহীন।
তখন একাঙ্কে নিত্য নাটকের যবনিকা পাত ?

কবিবরেষু

ছোটখাটো একখানি ঘর।
মাজাঘষা নয়, চকচকে চত্বর।
জানালায় দেখা যায় ট্রাম যায় দূরে
ধুলো তার দোতলায় আসে কিছু উড়ে।
রোদ আসে, ঝড় আসে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিরো গান।
নীল টবে ফোটা ফুল, গোলাপের ঘ্রাণ।

একটি টিপয়, সোফা, তিনটি চেয়ার
এর বেশি রাখবার ঠাঁই নেই আর।
দেওয়ালে 'দাভিঞ্চি', টিপয়ে 'ঠাকুর'।
সেল্ফে সেল্ফে বই-ও প্রচুর।
প্লেনে আসে তার যতো ইংরেজী বই ;
শুনি, তিনি বায়রণ পড়ান ভালোই।
বেঁটে-খাটো ফিট্‌ফাট একটি মানুষ ;
কোনোদিকে নেই তার হুঁস।
বাইরে বিরাট খ্যাতি, পরম আদর।
ভেতরে থাকেন তিনি : একখানি ঘর।

এ-ঘরে থাকেন তিনি। কাত্ হয়ে সোফায় বসেন।
কখনো দু'চোখ বইয়ে। কখনো লেখেন।
চেনাজানা লোকজন এলে
কাগজ-কলম-কালি ফেলে
বলেন : এলেন যদি একটু বসুন,
আমাদের কাগজে লিখুন।

তারপর আধুনিক কবিতা শোনান।   কথা ক'ন।
চায়ের আসরে জমে লণ্ডন ও শান্তিনিকেতন।
তখন তাকেই যদি কেউ এসে মিটিঙে ডাকেন,
শরীর খারাপ বলে একটু হাসেন।
তারপর কথা নেই ; বন্ধ আলাপ।
একখানি ছোটঘর : সব চুপচাপ।

রূপবলোকা

খুঁজে তাকে পাবে কিনা
জানিনা, জানিনা।
রোদের আঙিনা জুড়ে তার স্পষ্ট দু'পায়ের ছাপ
এইতো মিলালো।
আলো-ছায়া-মুখ তার জলগর্ভে যদিও হারালো
ঢেউয়ে আছে শঙ্খের সংলাপ।

রূপ তার কি যে ছিল,
জন্ম তার হয়েছিল কবে,
সে-কথা কে ক'বে ?

আমরা পেয়েছি কাছে তার
বিচিত্র সংসার ;
ঊষা থেকে সন্ধ্যা, আর সন্ধ্যা থেকে ঊষা
ভগ্নীর শুশ্রূষা ;
স্নেহ স্তন মায়ের মতন ;
পিতৃসত্য, পিতার শাসন।

পাই বা না পাই তাকে, চিনি বা না চিনি,
মাতা-পিতা, তুমি-আমি সকলেই তার কাছে ঋণী ॥

সুরোচ্চার

ঘাসের বুকে সকৌতুকে হেঁটেছি বহু দূর,
হৃদয় হতে এখনো তবু জাগেনি কোনো সুর।
সোনায় মোড়া হৃদয়ে আছে লুকোনো কথা যেন—
বেরিয়ে যাক ইচ্ছে মতো—লুকিয়ে থাকা কেন।
সাগরে দেবো ছড়িয়ে আর আকাশে ছুঁড়ে তা' কি,
গাছের ডালে জড়িয়ে যাবে, কুড়িয়ে নেবে পাখি?

সে-গান যদি লুকিয়ে রাখি নিজেকে দিতে সুখ
আসর হবে দুদিনে খালি, মৌন হবে মুখ।
কখনো যদি ছড়াতে পারি একটি দুটি গানই—
সে-গান নিয়ে করবে হেসে অনেকে কানাকানি।
হৃদয় হবে বিশাল আরো, পৃথিবী বড়ো হবে,
আসর জুড়ে আসবে আরো অনেকে উৎসবে।
ছড়িয়ে গেলে সে-গান—যায় আঁধারে পথ চলা ;
পা ফেলে ফেলে চলেছি—চাই সুরেই কথা বলা।

স্বীকরণ

তারপর ঘুম ভাঙে যদি,
ঝিরিঝিরি সেই ধারা মাটি মেখে হবে অন্য নদী,
থাকবে না নিরবধি ফেনার অবধি।
সে-ই হবে কথার সাগর। হারাবে মোহনা,
বুকে তার অফুরন্ত সৃষ্টির দ্যোতনা।
খুঁজবে সে অন্য স্বাদ, অন্য কোনো মানে,
মিলে গিয়ে মিলবেনা, থামেনা কখনো কোনোখানে।
অথচ মেলাতে সে-ই জানে!

সমাজ সংস্কৃতি মন
অনুভব আর ধ্রুব ইনটুইশ্যন
সে-ধারাকে করেছে প্রখর গতিময়;
এনেছে সে মানবতা প্রীতি প্রেম সর্বান্বয়।
তবু সে-ই ভেঙে দেয় পুরাতন নিয়মকানুন।
সাগর সে হতে পারে। বুকে তার অনেক আগুন।